'এবং মহুয়া' – বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত ১৬পৃ. তালিকার (৩১১টির মধ্যে) ৩পৃ. ৩০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা, আগষ্ট, ২০২১

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.ব.।

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 137 Volume

Aug, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প : অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালা

ড. প্রত্যুষ কুমার জানা

নন্দনতাত্ত্বিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যত আলোচিত ছোটোদের যাত্রাপালাকার অবনীন্দ্রনাথ প্রায় ততটাই অনালোচিত। কোন শিল্পীর আত্ম-প্রকাশক অনন্য বিশেষণের 'লেবেল'র ফলে তাঁর সামগ্রিক সত্তার অনুন্মোচিত হওয়ার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে ভুরি ভুরি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'চিত্রশিল্পী'- 'শিল্পগুরু' বা 'নন্দনতাত্ত্বিক' হিসাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোচিত। তার বাইরে তাঁর অন্যকোন শিল্পসত্তার অন্বেষণের তেমন প্রয়াস নেই। অথচ মনের আনন্দে ১৯৩৩ খ্রিঃ থেকে টানা দশ বছর একের পর এক যাত্রাপালা লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'প্রকাশ ভবন' প্রকাশিত ৪৭৬ পৃষ্ঠার 'অবনীন্দ্র রচনাবলী'র ষষ্ঠ খণ্ডে আছে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে চব্বিশটি যাত্রাপালা। ৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত সপ্তম খণ্ডে আছে- 'যাত্রাগানে রামায়ণ' নামক একটি পালা। এর বাইরেও ১৪০০ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'আনন্দমেলায়' প্রকাশিত হয়েছে— 'পুতুলখেলুড়ির কথা'। 'প্রতিক্ষণ' থেকে ১৪১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'খুদ্দুর যাত্রা'।

বাংলা যাত্রার ইতিহাসের দিকে চকিত দৃষ্টিপাতে সচেতন পাঠকমাত্রেই চোখে পড়বে— নান্দনিক বোধহীনতা ও স্থুলরুচির প্রসঙ্গ। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থুল রুচি নিয়ে উনিশ শতকের যাত্রা পরিবেশিত হত বলে বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রাকারদের 'নীচব্যবসায়ী' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮-শে জুন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন— "কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হওয়াতে, ইহাতে প্রমোদমত্ত ইতরলোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষবিধান হয় না।"[১] ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ বা তার পুর্ববর্তীকালের 'যাত্রা' নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের অভিযোগের স্পষ্ট অভিমুখ হল – যাত্রাপালাকার এবং যাত্রামোদী দর্শক উভয়ের রুচিবিকৃতি। দ্বিতীয়তঃ যাত্রাপালাকারদের স্থুলরুচির পরিবেশনকৌশল। ভদ্রশ্রেণির মানুষের পালা রচনায় মনোনিবেশ না করা। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"কয়েক বৎসর হইল কলকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে তথাচ পেশাদারিতা প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহাদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে উৎকৃষ্ট হইতে

পারে নাই; এবং বোধ করি শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিবেচনাতেই সংগীত বিদ্যায় গুণান্বিত কয়েকজন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন।'[২]

মতিলাল রায় যাত্রাকে নিম্ন-রুচির অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে গীতাভিনয় বা অপেরার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আবার থিয়েটারের রসদকে আয়ত্ত করে নিয়ে বাংলা যাত্রা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া চেষ্টা করেছে। বিশ শতকে পেশাদারিত্ব অর্জন করেছে বাংলা যাত্রা। পেশায় শিক্ষক, পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'বজ্রনাভ' (১৯৩২) পালার মধ্য দিয়ে পেশাদার যাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেন।

'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য যাত্রার বিশিষ্টতা ও প্রযোজনারীতি বিশ্লেষণ করে লোকনাট্যের ছয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন— সংগীত, সংলাপ সংযোজন, কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপনা, চরিত্র সন্নিবেশ, লোকশিক্ষা, রসসৃষ্টি। প্রাচীন এই লোকশিল্পের সব বিশিষ্টতা অবনীন্দ্রনাথের কোন একটি যাত্রাপালায় নয়, বরং কোন না কোন যাত্রাপালায় তা প্রত্যক্ষ করা যাবে। যাত্রার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার প্রয়োগ কৌশল অন্বেষণের প্রয়াস করা যেতে পারে।

'অশ্রুমতি' নাটকে অক্ষয় মজুমদারের অভিনয় ও নৃত্য শিশু-মনে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করল। তার প্রভাবে 'ড্রামাটিক ক্লাব' 'খামখেয়ালী' তে কমিক চরিত্রে ক্রমাগত অভিনয় করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'খামখেয়ালী'র যুগেই ছোটোদের জন্য 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল' লিখেছেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন লোকশিল্প যাত্রাকে তাঁর সাধনার বিষয়ীভূত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"দশ-এগার বছর ছবি আঁকি নি। আরব্য-উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, 'এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব-কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।' ব্যস, তারপর থেকে ছবি আঁকা বন্ধ, কিজানি কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।"[৩]

যাত্রায় সংগীত সংলাপের অপরিহার্য পরিপূরক। অভিনীত যাত্রায় সংগীত কেবল প্রাচীন প্রথার অনুবর্তনমাত্র নয়, তা রসসঞ্চারের অপরিহার্য উপায়। যাত্রায় এই উপকরণ নানাভাবে সংযোজিত হয়- প্রস্তাবনাগীতি, জুড়ির গান, একানে বালকের গান, গনের গান, যাত্রা ডুয়েট, যাত্রা ব্যালে, বিবেকের গান। অবনীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে সব ধরনের গানকেই যাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এর নেপথ্যে তাঁর অন্তর অভিপ্রায় ছিল এই লোকশিল্পের অকৃত্রিমতাকে অক্ষুন্ন রাখা। আবার কোথাও কোথাও প্রস্থাবনা গীতি ও জুড়ির গানকে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে যাত্রায় জুড়ির গীতের প্রভাব কমতে থাকে, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে জুড়ির গীতের প্রয়োগ বন্ধ হয়ে গেলেও অবনীন্দ্রনাথের পালায় তার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যনীয়। আবার জুড়ির গানের জায়গায় আসে বিবেকের গান— অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার' পালা (১৯০১) থেকে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে বিবেকের গান নেই। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে

অভিনয়ের উপর জোর দেওয়ার ফলে সংগীতের প্রাধান্য কমতে থাকে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা পালায় গানের প্রাধান্য বেশি- তুড়িজুড়ির গীত আছে, আছে গণের গীত, প্রস্তাবনা গীতের জায়গায় এসেছে জুড়ি দোহারের গান, কখনো চিত্রকরের চিত্র দর্শানো। তেত্রিশ পৃষ্ঠার 'উড়নচণ্ডীর পালা'য় আছে— ৩৮ টি গান, পরশুরামের 'জাবালি' গল্প অবলম্বনে রচিত 'ঋষিযাত্রা'-য় গান আছে ১৭-টি, 'লম্বকর্ণ' পালায় ১৪টি, 'ধোড়া কাক বুড়ো শেয়ালের পালা' য় ৬-টি, 'বেণুকুঞ্জের পালা' য় ২৭টি, 'দুঃসহ পালা'-য় ৫-টি। 'মউর ছালের পালা'য় ২১ টি গান আছে। সম্পূর্ণ পালাটি গানে রচিত। 'কঞ্জুসের পালা'-য় ১২টি গান আছে। যেমন গণের গীত—

"আরে এগোও যে, আরে পিছোও যে
আরে এগোও হে, আরে পিছোও হে
ঐ দেখো আসে কে, নেমে পড় গর্তে"[৪]

অবনীন্দ্রনাথ এই লোক-মাধ্যমকে আরো বেশি লোকায়ত করে তুলতে চরিত্র সংলাপে লোকসঙ্গীত ও লোকছড়ার সুরকে ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চাম ছাত চামের ঘর,
উড়ে পড় দামোদর, পারাছুট খুলে ধর,
উড়ে পড় ঝুলে পড়, উঠে পড় নেমে পড়,
ডুবে পড়, ভেসে পড়, ঘুরে পড় সরে পড় ..."[৫]

হাইপিচ্ অ্যাকটিং-এর সুবিধার জন্য লোকনাট্যে ছন্দোময় পদ্য সংলাপের প্রচলন আছে। যাত্রার পদ্য সংলাপে সাধারনত গৈরিশ ছন্দ, কখনো বা অমিত্রাক্ষরের প্রচলন ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রাপালায়, সংস্কৃত ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। তবে যাত্রাপালায় তাঁর পক্ষপাতিত্ব যে লৌকিক ছন্দের প্রতি তা তাঁর যাত্রাপালা পড়লেই বোঝা যায়। 'বৃক ও মেষপালা'য় পাঠক ও অধিকারীর কয়েকটি গদ্য সংলাপ ছাড়া পালাটি আদ্যন্ত লৌকিক ছন্দে রচিত। তাঁর যাত্রাপালায় লৌকিক ছন্দের দ্রুত লয় যাত্রার গতি সঞ্চারে সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া কখনো বা পয়ার ছন্দে, কখনো বা সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কঞ্জুসের পালা'য়—

"টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।"[৬]

যাত্রার প্রচলিত কাহিনীকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রাপালার কাহিনি হিসাবে গ্রহণ করেননি। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি নিয়ে কোন কোন পালা রচিত হলেও তাঁর যাত্রা পালায় বিষয়ের ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। কথামালা অবলম্বনে 'ফসকান পালা', হিতোপদেশ, ঈশপ কথিত 'বৃক ও মেষ পালা', এমনকি অনুজ রাজশেখর বসুর 'লম্বকর্ণ' গল্পকে নিয়ে 'লম্বকর্ণ পালা' ও 'জাবালি' গল্পকে নিয়ে 'জাবালির পালা' ও 'ঋষিযাত্রা' পালা রচনা করেছেন। সমুদ্রমন্থনজাত অলক্ষ্মীর অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন 'দুঃসহ

পালা', 'বালবোধিনী' নামক শ্রুতবোধ টীকাকার হংসরাজকে নিয়ে 'হংসনামা' পালা রচনা করেছেন।

রামায়ণ- কাহিনি রচিত যাত্রাপালা ছাড়া যুক্তির পারম্পর্যে গ্রথিত কাহিনি বা প্লট তাঁর যাত্রাপালায় নেই। এপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য—

"প্লট পাবে কোত্থেকে ? আমি কি প্লট ভেবে ভেবে লিখেছি ? ছোটো ছেলে মেয়েরা স্ফূর্তির সঙ্গে নাচবে গাইবে, এই তো যথেষ্ট। প্লট দিয়ে আমার কি দরকার ?"[৭]

তাঁর যাত্রাপ্যালায় আখ্যানে ঠাসবুনট নেই, কাহিনিও যৎসামান্য। গল্পের টানে নয়, সরসতার আকর্ষণেই তার যাত্রাপালা দর্শকদের আকৃষ্ট করে। তা কল্পলোকের রঙে রঙিন, কখনো উদ্ভট, আজগুবি। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় প্রথাগত অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন প্রায় নেই। চব্বিশটি পালার মধ্যে 'দুঃসহ পালা'য় আছে দুই অঙ্ক, তিনপর্বে 'জাবালি পালা', 'লম্বকর্ণ' ছয়টি পর্বে বিভক্ত, তিনটি দৃশ্যে 'বেণুকুঞ্জের পালা', দুইটি মঞ্জিলে 'ভুতপত্রীর যাত্রা'- প্রথম মঞ্জিল আবার তিনটি উপ-মঞ্জিলে বিভক্ত- 'মাসির বাড়ির পালা', 'কালুমেঘের পালা' ও 'চালতাতলার মাট' এবং দ্বিতীয় মঞ্জিলে কোন বিভাজন নেই। প্রথাগত ছাঁচকে অবনীন্দ্রনাথ ভাঙতে চেয়েছেন বলেই প্রথাগত অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন তাঁর যাত্রাপালায় তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। আবার কোন কোন পালায় আধিকারীর গীত ও তুড়িজুড়ির গীত দিয়ে পালার দৃশ্যান্তর ঘটিয়েছেন।

পাঁচালীকার পাঁচালীতে যেমন ভণিতা করেন অন্তত তাঁর দুটি পালায় এইরকম ভণিতা আছে। 'উড়নচণ্ডীর পালা'য় কূর্মের উক্তিতে আছে— 'না, বিলিতি ডাকপিওন পাখি, অবনীন্দ্রের চিঠি নিয়ে চলেছে লণ্ডনে তরুণ ঠাকুরের কাছে। ওকে বলে কেউ এরোপ্লেন, কেউ উড়োজাহাজ।'[৮] 'মউর ছালেরপালা'-য় অধিকারীর ভূমিকায় আছে-

"ছবির রাজা অবিন ঠাকুর ধরে ওটার মান,
সাত নকলের আসল রসটা চাখিয়া দেখান।"[৯]

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অননীন্দ্রনাথের কাছে সুরূপ-কুরূপ বলে কিছু নেই— কোনো বাছ-বিচার নেই। মানুষ, দেবতা, রাক্ষস-খোক্কসের সঙ্গে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ অনায়াসে সমান মর্যাদায় উঠে আসে। তারা মানুষের মতো সংলাপ বলে, প্যারোডি রচনা করে, নাচ-গান করে, জীবন সংকটকে প্রকাশ করে, সংকট কেটে গেলে আনন্দোদ্বেল হয়। বাংলা যাত্রায় অবনীন্দ্রনাথ ইতিহাস-পুরাণ-কথামালা-ঈশপ-রূপকথা-আরব্য রজনীর জগৎকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। আর সেই কারনে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলা, তদ্ভব, হিন্দী, ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রিক, আর্বি, ফারসী ইত্যাদি অনায়াসে জায়গা পেয়েছে। জগৎ ও জীবন যখন ইতিহাস-পুরাণ-কথামালা-ঈশপ-রূপকথা-আরব্যরজনীর তখন চরিত্রের প্রকাশ-মাধ্যমও তেমন, উদ্ভট জীবনের জন্য উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ-ধ্বন্যাত্মক চিত্র রূপায়ন। অবনীন্দ্রনাথ বলবেন— "নানারকম বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেছি কিরকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।" যাত্রাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন— যাত্রাপালায় এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ যাত্রাপালায় শুধু ছবি এঁকেই ক্ষান্ত থাকেনি,

যাত্রাশিল্পের অন্তর অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করেছে— পালাকে করে তুলেছে 'খরপরশা'। ক্রিয়াপদের কথ্যরূপে স্থিতির মধ্যে গতির ক্ষিপ্রবেগ হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেমন—

"চলো আংকু বাংকু ঠ্যাংউ ঠাংকু-
লেংচু লেংচু ল্যাজ গুড়াংকু।
চোঁ চা চু-চু হাঃ হা হুঃ হুঃ উঃ হু
এংচু ভেংচু লেংচু লেংচু।
ল্যাজ গুড়াংকু ঠ্যাংউ ঠাংকু
থেংকু থেংকু
গ্রেপছার সাউআর
চেয়ে দেখে থেংকু।"[১০]

কিংবা—

"দ্রুম্ দদ্দড় দুম্ ধদ্ধর ধদ্ধর কিঃপ্পোলো,
শিল পোলো নয়া নোড়া পোলো-
খিল পোলো খিল পোলো,
দ্রুম্পোলো দ্রুম্পোলো-
সিংদরজায় আমকাঠের কপাট পোলো।"[১১]

অথবা—

"ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক
অট্ট হট্ট ঘট্ট ঘট্ট।
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক
চক্ক চক্ক ভক্ক ভক্ক।
দে দমাদম্ দম দমাদম রক্ত ভক্ষ।"[১২]

যাত্রাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ জানেন—

"যাত্রার অর্থ-ই হচ্ছে চলাচল। পুরো পালাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের বিশ্রাম দিলে সেখানে কাজ চলে না। পুরো যাত্রা বা পালা-গান তিন চার ভাগে তিন চার দিন ধরে চলার নিয়ম ছিল, কাজেই প্রত্যেকভাগ শুরু থেকে শেষ একটা পুরো জিনিষ করে খাড়া করা হত।"[১৩]

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের চিত্র যেমন রঙের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে এক অলৌকিক চিত্রমালা, সে মায়াময় দ্যুতি নির্মাণ করে, সে রূপকথার জাল বোনে, সে ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর যাত্রাপালা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে— তার যাত্রাপালায় যে তথ্য সন্নিবেশ আছে তার সবটাই কিন্তু তাঁর সকপোল কল্পিত নয়। যেমন 'হংসনামা' পালায় হংস ভট্ট প্রাচীন সংস্কৃত কবি, 'বালবোধিনী' টীকাকার, 'ভিষকচক্রচিত্তোৎসব' বৈদ্যক গ্রন্থ রচয়িতা, উল্লিখিত 'হংসরুৎ' ছন্দের গঠন—'স্লৌ গ্লৌ হংসরুতমেতৎ' ও সংস্কৃত শাস্ত্র সম্মত।

ছেলেবেলায় 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' দেখে যে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন তার হদিশ

আর কোন যাত্রাপালায় পাননি। তাই তাঁর আক্ষেপ—

"প্রাণখোলা হাসি, আজকের দিনে অমন হাসি বড়ো মিস করি। হাসতে জানেনা লোকে। তাঁদের ভিতরে অনেক দুঃখ, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল মানি, কিন্তু হাসতেন যখন— ছেলেমানুষের মতো প্রাণখোলা হাসি।"[১৪]

তাই তাঁর যাত্রাপালা হাস্যরসে ভরপুর— কোন পালায় পরিমিত, কোন পালায় প্লাবিত। যেমন 'রামচন্দ্রি গীতাভিনয়ে' আছে পরিমিত হাস্য। লোক হাসাতে প্যারোডি গানের ব্যবহার যাত্রা গানে বহুল প্রচলিত। অবনীন্দ্রনাথ সরসতার প্রকাশে সংস্কৃত শ্লোক, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্র সংগীত সবের-ই প্যারোডি রচনা করেছেন। যেমন—

"হংসবীজং পরং বনং বৃহণম্ বাতনাশনং।
পাকে লঘুতরং প্রোক্তং সর্বাময়বিনাশনম্।।"

'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থের এই শ্লোক তুড়িজুড়ির গীতে রূপ পেল—

"কলহংসের ডিম, খেলে হবে ভীম।
বাত রোগ দূর হবে-মোটা হবে ক্ষীণ।
অতি লঘু পাক- হয় সহজেই পাক।
রোগ বিপাক হরম্।।
উপকারী পরম - হাঁসের ডিম।"[১৫]

তাঁর যাত্রাপালায় প্রবাদ বাক্য আছে, নীতিবাক্য আছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আছে। গজ কচ্ছপের ভাতৃ বিরোধে কাক মজা নিচ্ছে দেখে কচ্ছপ বলেছে- "থাক ভাই তোরই জিৎ-লড়ালড়ি আজ ধামাচাপা থাক বড়ো হাসি হাসছে কাক।'[১৬] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আছে 'লম্বকর্ণ ' পালায়—

"এই মুসলমান আর হিদুঁয়ান ছিল জেতের বিচার
ভেবে দেখো তাম্বাকুতে কইল একাকার।"[১৭]

যথার্থ পাণ্ডিত্য থাকলে স্থুল রুচি ছাড়াও যাত্রাপালা কত বিচিত্র বিষয়ে, প্রথাগত আঙ্গিক বিরহিত হয়েও তা গণমনোরঞ্জনে, রসসঞ্চারে সহায়ক হতে পারে অবনীন্দ্রনাথ তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি যাত্রাকে চেনা ছাঁচে গড়তে চেয়েছেন কিন্তু ছকে বাঁধতে চাননি। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় বিষয় সীমানার ব্যাপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন এই লোকনাট্যের মূল কথা লোক মনোরঞ্জন-দুঃখ দুর্দশাদীর্ণ বাস্তব-জীবনের থেকে কল্পলোকে, প্রাণখোলা হাসির জগতে খানিক বিচরণ। এজন্য হাস্যোদ্রেককারী রূপকথা, উদ্ভট কাহিনি ও চরিত্রের সমাবেশ, গান ও কবিতার প্যারোডি রচনা, শব্দ প্রয়োগে শুচি বায়ুগ্রস্ততা পরিহার, অভিনেতার সঙ্গে দর্শক-শ্রোতার দূরত্ব ঘোচাতে লোকজ শব্দের ও লোক-ছন্দের ব্যবহারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর পালাগুলির উপভোগ্যতা যতখানি মঞ্চায়নে, ততখানি পাঠোপযোগী নয়।

তথ্যসূত্র :

১। ঈশ্বর গুপ্ত, সংবাদ প্রভাকর, সম্পাঃ ঈশ্বর গুপ্ত, ২৮-শে জুন, ১৮৪৮।
২। বঙ্গীয় নাট্যশালারইতিহাস,ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ,২০১৫,পৃ. ২০।
৩। জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-১ম খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, আগষ্ট-২০১০,পৃ. ২৯২।
৪। সকলের গীত, জাবালির পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬৪।
৫। চামচিকি নৃত্যগীত, উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩।
৬। কঞ্জুষের পালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৯।
৭। অবনীন্দ্রনাথ :যাত্রার আসরে নিঃসঙ্গ পথিক,পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়,যাত্রাআকাদেমি পত্রিকা-৫, সম্পা-প্রভাতকুমার দাস,পশ্চিমবঙ্গ যাত্রাআকাদেমি,কলকাতা,জুন-২০১০ পৃ.৯
৮। উড়নচণ্ডীর পালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬।
৯। মউর ছালেরপালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৪।
১০। ফসকান পালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৯৪।
১১। ভুত পত্রীর যাত্রা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৯।
১২। হংসনামা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৮৯।
১৩। যাত্রা ও থিয়েটার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা-৫, সম্পা- প্রভাতকুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, কলকাতা, জুন-২০১০ পৃ. ২।
১৪। ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-১, প্রকাশভবন, কলকাতা, আগস্ট-২০১০, পৃ. ১১৬।
১৫। হংসনামা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৮২।
১৬। গজ-কচ্ছপের পালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭৫।
১৭। লম্বকর্ণ পালা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী-৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩০।